Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুফিবাদ এবং আধুনিক সমস্যা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নার্গিস জাহান নূর

রোলঃ ২৩১০০১২১০৫৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুফিবাদ এবং আধুনিক সমস্যা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নার্গিস জাহান নূর

রোলঃ ২৩১০০১২১০৫৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সুফিবাদ এবং আধুনিক সমস্যা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নার্গিস জাহান নূর, আইডিঃ ২৩১০০১২১০৫৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সুফিবাদ এবং আধুনিক সমস্যা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

নার্গিস জাহান নূর

আইডিঃ **২৩১০০১২১০৫৯**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

উৎপত্তিঃ 5

শব্দতত্ত্ব..7

তাসাউফ বনাম সুফিবাদ..8

সুফীবাদের মূলনীতি ও স্তর সমূহঃ...17

সুফিবাদ কি ইসলাম সমর্থন করে?..18

ইসলাম প্রচারে সুফিদের ভূমিকা (বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে)ঃ.......................................21

সুফিবাদে আধুনিক সমস্যাঃ 25

উপসংহারঃ 46

তথ্যসূত্রঃ...46

উৎপত্তিঃ

مُتَصَوِّف ّ, *সুফি*, صُوفِي, ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য: اَلتَّصَوُّف**সুফিবাদ** বা **তাসাউফ** , (আরবি: *মুতাসাউয়িফ*) যাকে বিভিন্নভাবে ইসলামী আধ্যাত্মবাদ অতীন্দ্রিয়বাদ বা রহস্যবাদ, ইসলামের অন্তর্নিহিত রূপ, ইসলামের অন্তর্গত আধ্যাত্মিকতার অদৃশ্য অনুভূতি হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়, তা হল ইসলামে আধ্যাত্মবাদ, যা নির্দিষ্ট মূল্যবোধ, আচার-প্রথা চর্চা, মূলনীতি দ্বারা বিশেষায়িত, যা ইসলামের ইতিহাসের খুব প্রাথমিক দিকে শুরু হয়েছিল, এবং এটি ইসলামের আধ্যাত্মিক চর্চার "প্রধান অভিব্যক্তি ও কেন্দ্রীয় স্বচ্ছতা"কে তুলে ধরে। সুফিবাদের চর্চাকারীদের "সুফি" বলে আখ্যায়িত করা হয়ে *মুতাসায়িফাহ;* مُتَصَوِّفَة *সুফিয়ুন;* صُوفِيُّون *সুফিয়াহ;* صُوفِيَّة**থা**কে (আরবি বহুবচন: *মুতাসায়িফুন*) ।ইসলামে *তাসাউফের* আরেকটি সমার্থক ধারণা হল তাজকিয়া مُتَصَوِّفُون)تزكية। (

ঐতিহাসিকভাবে, সুফিগণ প্রায়শই বিভিন্ন তরিকা বা ধারার অনুসারী - এমন কিছু ধর্মসভা যা কোন মহান শিক্ষাগুরুকে কেন্দ্র করে গঠিত, যাদের ওয়ালি বলে আখ্যায়িত করা হয়, এবং তারা আনুসারীদের সঙ্গে ইসলামী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সিলসিলা স্থাপন করেন। এই তরিকাগুলো জাওয়াবিয়া, খানকা বা তেক্কে নামক কোন নির্দিষ্ট স্থানে মজলিস নামক আধ্যাত্মিক বৈঠকে মিলিত হয়তারা *ইহসানের* (ইবাদতের পূর্নাঙ্গতা) জন্য সংগ্রাম করে, যা একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত আছে: "ইহসান হল এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যে, তুমি তাকে দেখছো, অথবা তুমি তাকে না দেখলেও নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।"সূফিগণ মুহাম্মদ (সা.) -কে (প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর নৈতিকতাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করেছেন) বলে আখ্যায়িত করে থাকে,এবং তাঁকে নেতা ও প্রধান আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখে।

সকল সূফি তরিকা মুহাম্মদ (সা.) এর কাছ থেকে পাওয়া তাদের অধিকাংশ অনুশাসন তার চাচাতো ভাই ও জামাতা আলীর বরাতে গ্রহণ করে থাকে, এবং তাকে উল্লেখযোগ্য আলাদা ও বিশেষ ব্যক্তি মনে করে।

যদিও প্রাচীন ও আধুনিক সূফিদের সিংহভাগই ছিল সুন্নি ইসলামের অনুসারী, মধ্যযুগের শেষভাগে শিয়া ইসলাম পরিমন্ডলের ভেতরেও কিছু সুফি ধারার বিকাশ ঘটে।যদিও সুফিগণ কট্টর রীতিনীতির বিরোধী, তারপরও তারা ইসলামী আইন কঠোরভাবে মেনে চলে এবং তারা ইসলামী ফিকহ ও ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন ধারার অন্তর্ভুক্ত। সুফিদের অন্যতম

বৈশিষ্ট্য হল তাদের সন্ন্যাসবাদ, বিশেষত যিকির নামক আল্লাহকে স্মরণ চর্চার সাথে তাদের ঐকান্তিক সম্পর্ক, যা তারা প্রায় সময় সালাতের পর করে থাকে।প্রারম্ভিক উমাইয়া খিলাফতের (৬৬১-৭৫০) জাগতিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরুপ তারা মুসলিমের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য হারে অনুসারী লাভ করে এবং এক সহস্রবছর সময়ের মধ্যে বহু মহাদেশ ও সংস্কৃতিতে তারা বিস্তৃতিলাভ করে, প্রাথমিকভাবে আরবি ভাষায় এবং পরবর্তীতে ফারসি, তুর্কি ও উর্দু ভাষায় অন্যান্যদের মাঝে তাদের বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার করে। সুফিগণ তাদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উইলিয়াম চিট্টিকের মতে, "বিস্তৃত পরিসর হতে দেখলে, সুফিবাদকে ইসলামী বিশ্বাস ও চর্চার অন্দরসজ্জা ও প্রগাঢ়তার কার্যক্রম হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।"আধুনিক সময়ে সুফি তরিকাগুলোর সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পাওয়া এবং সুফিবাদের কিছু দিক নিয়ে আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদ ও রক্ষণশীল সালাফিবাদীদের সমালোচনা সত্ত্বেও, সুফিবাদ ইসলামী বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে, এবং পাশাপাশি পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন রূপকেও প্রভাবিত করেছে।

শব্দতত্ত্ব

সুফি শব্দটির দুইটি ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। সাধারণভাবে, শব্দটির আভিধানিক অর্থ *ṣafā (صفاء)* এর থেকে এসেছে, যার আরবি অর্থ *বিশুদ্ধতা* বা *পবিত্রতা* বা *শুদ্ধতা* বা *পাপশূণ্যতা,*এ প্রসঙ্গে তাসাউফের অনুরূপ ইসলামের আরেকটি ধারণা বিবেচিত হয়ে থাকে যা তাজকিয়া (تزكية, অর্থ : আত্মশুদ্ধি) নামে পরিচিত, যা সুফিবাদেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরেকটি আরবি মূল পাওয়া যায়, যা *পশম, ṣūf (صُوف),* শব্দটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। পশম ছিল তৎকালীন মুসলিম তাপসদের সাধারণ পোশাক।সুফি আল-রুধাবারি এই দুইটি মূলকে একত্রিত করেছেন যিনি বলেন, "সুফি হলেন সে ব্যক্তি যিনি সর্বোচ্চ পরিশুদ্ধ অবস্থায় পশমী বস্ত্র পরিধান করেন।"তবে আল-কুশাইরি এবং ইবনে খালদুন উভয়ই ভাষাগত ভিত্তিতে সউফ ছাড়া অন্যান্য অর্থের সম্ভাবনার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতরা একমত হয়েছেন যে, "সউফ" (*ṣūf*) বা *পশম* হল "সুফি" শব্দটির সম্ভাব্য মূল। আবার অনেকের মতে সুফি শব্দটি এসেছে আসহাবে সুফফা থেকে, আশ্রয়হীন সাহাবীদের একটি দল, যাদের নবী মুহাম্মদ মসজিদে নববী প্রাঙ্গনে সুফফা নামক স্থানে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, তারা সেখানে নবী মুহাম্মদ কে সাহচার্য দিতেন এবং সেখানে যিকির করতেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত সাহাবা ছিলেন আবু হুরাইরা। কেউ কেউ আল মসজিদ নববীতে বসে থাকা ঐ সহাবাদের প্রথম সুফি হিসেবে বিবেচনা করেন। আবুবকর মুহাম্মূদ জাকারিয় তার *হিন্দুসিয়াত ওয়া তাসুর* গ্রন্থে বলেন, কামেল মোস্তফা আল-শাইবি ও আব্দুল্লাহ নমসুক পৃথক গ্রন্থে বলেন যে প্রথম যেই ব্যক্তি সুফি শব্দটি ব্যবহার করেন, তার নাম আবু হাশেম আল কুফী (দ্বিতীয় হিজরি শতক), এবং ইবনে তাইমিয়া তার মাজমুয়াল ফাতওয়া গ্রন্থে বলেন, বসরা ছিল সেসময় সুফিবাদের একটি কেন্দ্র।অনেকের মতে গ্রিক শব্দ sophos বা জ্ঞান, theosophy বা ধর্মতত্ত্ব, philosophy বা দর্শন থেকে থেকে সুফি শব্দটি এসেছে, কিন্তু নিকোলসন এই মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ ফিলোসোফির আরবি রুপান্তর ফালসাফাতে সীন ব্যবহার করা হয়েছে, সোয়াদ নয়, কিন্তু সুফি ও তাসাউফ শব্দ দুটিতে সোয়াদ বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আবার অনেকের মতে সুফি শব্দটি এসেছে আসহাবে সুফফা থেকে, আশ্রয়হীন সাহাবীদের একটি দল, যাদের নবী মুহাম্মদ মসজিদে নববীর প্রাঙ্গনে সুফফা নামক

স্থানে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, তারা সেখানে নবী মুহাম্মদ কে সাহচার্য দিতেন এবং উসামা বিন সাবিতের অধীনে কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যয়ন চর্চা করতেন।

তাসাউফ বনাম সুফিবাদ

ঐতিহাসিকভাবে, মুসলমানরা সুফিদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে প্রকাশ করার জন্য *তাসাউফ* শব্দটি ব্যবহার করত।ঐতিহাসিক সুফিদের মতে, তাসাউফ ইসলামের একটি বিশেষ রূপ যা ইসলামিক শরীয়াহ আইন এর অনুরূপ। তাদের মতে, বিশ্বের সকল প্রকার মন্দ এবং গর্হিত কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শরীয়াহ এই বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তারা মনে করেন, তাসাউফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য এবং ইসলামিক বিশ্বাস এবং অনুশীলনের অপরিহার্য অংশ।কার্ল এর্নস্ট এর মতে, সুফিবাদ শব্দটি কোন ইসলামিক গ্রন্থ বা কোন সুফিদের কাছ থেকে আসেনি। তার মতে শব্দটি এসেছে প্রাচ্যের ভাষা বিষয়ক ব্রিটিশ গবেষকদের থেকে। ইসলামিক সভ্যতায় (ইসলামিক আধ্যাত্মিকতা) তারা যে মনোমুগ্ধকর বিষয় উপলব্ধি করেন এবং তৎকালীন যুক্তরাজ্যে ইসলাম সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণা বা বিশ্বাস বিরাজ করছিল তার মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করতে তারা সুফিবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন।তবে তাসাউফ বা সুফি শব্দ দুটি কোরআন ও হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় নি।

তরিকা (বা *তরিকাহ্*; আরবি: طريقة *ṭarīqah*) অর্থ পথ বা পদ্ধতি । ইলমে তাসাউফ বা রুহানি জ্ঞান অর্জনের নির্ধারিত পথ বা পদ্ধতি হলো তরিকা। অর্থাৎ তাসাউফ অর্জনের সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি হলো তরিকা।

এর দ্বারা হাকীকত লাভের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন করা হয়।তরিকাতে একজন ইমাম থাকেন যিনি আধ্যাত্মিক নেতার ভূমিকা পালন করেন। প্রত্যেক তরিকায় অনেক মুর্শিদ বা পীর সাহেব থাকেন। যারা এই তরিকা শিক্ষা দান করেন। পীর সাহেবের অনুসারীদেরকে মুরিদ বলা হয়। আবার একজন পীর সাহেব একাধিক তরিকারও শিক্ষা প্রদান করেন।

বেশ কিছু সুফি তরিকা প্রচলিত রয়েছে। যেমন কাদেরিয়া, চিশতিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া , মুজাদিদ্দিয়া, মুহম্মদিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া মাদারিয়া ও শাজেলীয়া ইত্যাদি।

প্রধান সূফি তরিকাসমূহ

তরিকা শব্দটি সুফিবাদের একটি গোষ্ঠী বা বর্গের জন্য, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং হাকিকত (চূড়ান্ত সত্য) সন্ধানের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত তরিকায় একজন মুর্শিদ (পীর/মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক) রয়েছে যিনি নেতা বা আধ্যাত্মিক পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন। তরিকার অনুসারীরা মুরিদীন (একবচন মুরিদ) নামে পরিচিত, যার অর্থ "অভিলাষী", যেমন "মহান আল্লাহকে জানার এবং ভালোবাসার জ্ঞান কামনা "। সুফিবাদ উৎকর্ষ লাভ করে পারস্যে। সেখানকার প্রখ্যাত সুফি-দরবেশ, কবি-সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ নানা শাস্ত্র, কাব্য ও ব্যাখ্যা-পুস্তক রচনা করে এই দর্শনকে সাধারণের নিকট জনপ্রিয় করে তোলেন। কালক্রমে বিখ্যাত ওলিদের অবলম্বন করে নানা তুরুক বা তরিকা গড়ে ওঠে।

পশ্চিমা বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় তরিকা হলো মৌলভি তরিকা , যা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমির নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। একই সময়ে, হাজী বেকতাশ ভেলি নামে বেকতাশি তরিকাও প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় পাঁচটি বড় তরিকা রয়েছে: নকশীবন্দী তরিকা , যা বাহা -উদ -দীন বুখরির নামানুসারে; কাদেরিয়া তরিকা, যা আব্দুল কাদের জিলানির নামে; চিশতিয়া তরিকা যা খাজা মইনুদ্দিন চিশতির নামে, তবে খাজা মইনুদ্দিন চিশতী সবচেয়ে বিখ্যাত পীর; সোহরাওয়ার্দীর , যা শাহাবুদ্দীন সোহারাওয়ার্দির নামে; এবং বুরহানিয়া তরিকা, যা পাকিস্তান ও ভারতের জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আফ্রিকার বড় তরিকাগুলির মধ্যে রয়েছে মুরিদিয়া, বুরহানিয়া এবং তিজানিয়া। অন্যান্য তরিকাগুলো প্রধান তরিকার শাখা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। যেমন, কালান্দারিয়া তরিকা শিকড় মালামাতিয়া এবং ওয়াফাইতে রয়েছে (যা ইয়াসাভিয়া-সুন্নি এবং বাতিনিয়া-শিয়া তরিকার সমন্বয়)। সোহরাওয়ার্দী তরিকার শাখা হিসেবে এই তরিকাগুলো বিকশিত হয়েছে। ১৩শ শতাব্দীর বিখ্যাত সুফি সাধক আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনানির নামে আশরাফিয়া তরিকা চিশতিয়া তরিকার একটি উপশাখা।

মাইজভান্ডারি তরিকা একটি স্বাধীন সুফি তরিকা, যা ১৯শ শতকে বাংলাদেশে গাউসুল আজম শাহ সুফি সৈয়্যূ আহমা্ুল্লাহ মাইজভান্ডারি (১৮২৬-১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ), যিনি ইসলামের নবী মুহাম্মদের ২৭তম বংশধর, দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ারসি তরিকা

ওয়ারিস আলী শাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।বিশেষ কোনো সুফি তরিকায় অনুসারী হওয়াটা একচেটিয়া নয়, যেমনটি খ্রিস্টান সন্যাসী তরিকাগুলোতে কঠোর কর্তৃত্ব এবং ধর্মানুষ্ঠানের শাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুফিরা প্রায়ই বিভিন্ন সুফি তরিকার অনুসারী হয়ে থাকেন। সুফি তরিকার এই অ-একচেটিয়াতা সুফিবাদের সামাজিক প্রসারণের উপর প্রভাব ফেলে। এগুলোকে কেবল রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা প্রতিযোগিতার মতো বিবেচনা করা যায় না, বরং একসাথে মিলিত হয়ে সুফিবাদকে একটি সম্মিলিত ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার পরিবর্তে একটি সামগ্রিক ঐতিহ্য হিসেবে প্রকাশ পায়। সাধারণত, পীর তার জীবদ্দশায় তার খলিফা বা "উত্তরসূরি" মনোনীত করেন, যিনি তরিকাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে বিরল কিছু ক্ষেত্রে, যদি পীর খলিফা মনোনীত না করেই মারা যান, তাহলে তরিকার ছাত্ররা ভোটের মাধ্যমে আরেকজন আধ্যাত্মিক নেতাকে নির্বাচিত করেন। কিছু তরিকায়, মুরশিদের তরিকা থেকেই খলিফা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিছু সুফি গোষ্ঠীতে খলিফা হওয়ার প্রচলন আছে যে, পীরের পুত্রই খলিফা হন, যদিও অন্যান্য গোষ্ঠীতে খলিফা এবং পীর সাধারণত আত্মীয় হন না। কিছু তরিকায়, সদস্যদের আধ্যাত্মিক স্বপ্নের (বাশারত) মাধ্যমে একজন উত্তরসূরি নির্ধারণ করা হয়।

তরিকাগুলোর একটি শাজরা আরবিঃ سلسلة; "চেইন, পীরদের আধ্যাত্মিক বংশধারা") থাকে। সব তরিকাই দাবি করে যে তাদের সিলসিলা আলীরমাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ পর্যন্ত পৌঁছে, তবে নকশী বন্দী তরিকা এর শিকড় প্রথম খলিফা আবু বকর পর্যন্ত পৌঁছে, যিনি সুন্নি ইসলামের প্রথম খলিফা।

প্রত্যেক মুরিদ পীরের হাতে বায়াত দানের সময় তার পীরের কাছ থেকে তরিকার কিছু ধ্যান-সাধনার শিক্ষা নিয়ে থাকেন যা মুরিদ তার প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকে। মুরিদকে নামাজের মতোই পূর্ণ পবিত্রতার অবস্থায় থাকতে হয় এবং কাবার দিকে মুখ করে পীরের শিখিয়ে দেয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে অবলম্বন করে আধ্যাত্মিকতা চরম শিখরে পৌছানোর প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। একজন মুরিদ যখন শুরু পর্যায় থেকে সুফি তরিকায় আরও উচ্চতর স্তরে যায়, তখন তার পাঠ পরিবর্তিত হয় (সাধারণত এর জন্য অতিরিক্ত দীক্ষার প্রয়োজন হয়)। দীক্ষা অনুষ্ঠানটি সাধারণত কুরআনের প্রথম সূরা পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় এবং একটি নির্দিষ্ট বাক্য পাঠের মাধ্যমে শেষ হয়। উন্নতি লাভের জন্য কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করতে হয়। কিছু মুরিদ ধ্যানের সময় অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা লাভ করে, যেমন কণ্ঠ শুনতে পাওয়া—"তুমি কি একজন

নবীকে দেখতে চাও?" অথবা দৃশ্য দেখতে পাওয়া—এবং এগুলো যদি মুরিদের সাথে কথা বলে, তবে তারা "হাদরা" অনুষ্ঠানে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। হাদরা হলো সাপ্তাহিক দলবদ্ধভাবে প্রার্থনা পাঠ করার একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আত্মার সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করা হয়।

সাধারণত ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অনুসারী হিসেবে পরিচিত এই সুফি গোষ্ঠীগুলো কখনো কখনো উলামা বা সরকারি স্কলারদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং প্রায়ই ইসলাম ধর্মের অনানুষ্ঠানিক মিশনারি হিসেবে কাজ করে। তারা বিশ্বাসের আবেগময় প্রকাশের জন্য স্বীকৃত মাধ্যম সরবরাহ করত, এবং তরিকাগুলো মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা তাদের আকারের তুলনায় অস্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তার করত (যেমন, তিমুরের সেনাবাহিনীর ওপর সাফাভিদের শায়খদের প্রভাব অথবা আলি-শির নাভাইয়ের মিশনারি কাজ, যা তিনি তুর্কিস্তানে মঙ্গোল ও তাতার জনগণের মধ্যে সম্পাদন করেছিলেন)।

কাদেরিয়া তরিকা

কাদেরিয়া তরিকা পৃথিবীর প্রাচীনতম সুফি তরিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আওলাদে রাসুল সাঃ গাউসুল আজম সৈয়দ আব্দুল কা্ূের জিলানির (১০৭৭-১১৬৬) নাম থেকে এই তরিকার নামকরণ করা হয়েছে। জিলানে ইরানির একটি প্রদেশের নাম এবং এর অধিবাসীদের জিলানী বলা হয়ে থাকে। এই তরিকা ইসলামি বিশ্বে সর্বাধিক বিস্তৃততম সুফি তরিকাগুলো একটি এবং মধ্য এশিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক, বলকান এবং পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এই তরিকার অনুসারী রয়েছে। ইসলামের মূলধারার বাইরে কাদেরিয়া তরিকা কোন বিশেষ মতবাদ বা শিক্ষা গড়ে তোলেনি। এই তরিকার অনুসারীরা ইসলামের মৌলিক নীতিগুলিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই নীতিগুলোকে তারা ব্যাখ্যা করে।

চিশতিয়া তরিকা

চিশতিয়া ত্বরিকা (ফার্সি: چشتیہ) বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাতের হে উত্তর দিকে প্রায় ৯৫ মাইল দূরের ক্ষুদ্র শহর চিশতে ৯৩০ সালের দিকে এই তরিকার উদ্ভব হয়। তরিকাটি প্রতিষ্ঠাতা হলেন (খাজা) আবু ইশক শামি লেভ্যান্টে ফিরে আসার পূর্বে, স্থানীয় আমীর (খাজা) আবু আহমাদ আবদালের (মৃত্যু ৯৬৬) পুত্রকে বায়াত করান, তাকে সুফিতত্ত্বের উপর প্রশিক্ষণ দেন এবং খেলাফত (আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্ব) দান করেন। আবু আহমদের বংশধরদের, তারা চিশতিয়া নামেও পরিচিত, নেতৃত্বে চিশতিয়া

তরিকা একটি অঞ্চলভিত্তিক তরিকা হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।এই তরিকায় ভালবাসা, সহিষ্ণুতা ও উদারতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ১২ শতকের মধ্যভাগে গাউছুল আজম সৈয়দ খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি লাহোর ও আজমিরে এই তরিকা আনয়ন করেন। চিশতি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা আবু ইশক পর তিনি এই ধারার অষ্টম ব্যক্তি। বর্তমানে এই তরিকার বেশ কিছু শাখা রয়েছে

মাইজভান্ডারিয়া তরিকা

মাইজভান্ডারী তরিকা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী, যিনি হযরত কেবলা কাবা অধিক জনপ্রিয়, কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুফি তরিকা। এটি বাংলাদেশে সৃষ্ট একমাত্র তরিকা। এই তরিকা মূল নাম *তরিকায়ে মাইজভান্ডারীয়া*। এই তরিকা মূল বিষয় হচ্ছে প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ। এ রীতিমত যুগান্তকারী ঘটনা মাইজভান্ডারী দর্শনের সমন্বয় ধর্মী,বিশ্বমানবতার মিলন মন্ত্রের যে বীজ রোপণ করেছিলেন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী, তার তিরোধানের পর তারই ভ্রাতুস্পুত্র সৈয়দ গোলামুর রহমান যিনি বাবা ভান্ডারী নামে অধিক পরিচিত, বিশ্বব্যাপী এই তরিকার পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করে যথাযথ রূপদান করেছেন। প্রাণের তাগিদে,ত্রাণের তাগিদে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন মাইজভান্ডার দরবার শরীফে। মাইজভান্ডারী ত্বরিকার দেশ বিদেশে লক্ষ কোটি ভক্ত অনুসারী রয়েছে।

নকশাবন্দি তরিকা

নকশবন্দি তরিকা হল ইসলামের প্রধান সুফি তরিকাগুলোর একটি। পূর্বে এ তরিকা *সিদ্দিকিয়া* নামে পরিচিত ছিল, কারণ এই তরিকার ধারা পেছনের দিকে আবু বকরের মাধ্যমে মুহাম্মদ (স) এর সাথে সম্পর্কিত করে। অনেকেই এই তরিকাকে "শান্ত" তরিকা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, কারণ এই তরিকায় জিকির (স্রষ্ঠাকে স্মরণ করা) নীরবভাবে করা হয়ে থাকে যদিও অন্য তরিকাগুলোতে উচ্চস্বরে বা হালকা উচ্চস্বরে জিকির করা হয়ে থাকে। "নকশবন্দি" শব্দটি (نقشبندی) ফার্সি শব্দ, এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বাহা উদ-দিন নকশাবন্দ বুখারীর নাম থেকে গৃহীত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে নকশবন্দ শব্দটির অর্থ "চিত্রকরের সাথে সম্পর্কিত", আবার অনেকে মনে করেন এর অর্থ "চিত্রকর" এর পরিবর্তে "আদর্শ প্রণেতা" এবং "নকশবন্দ" শব্দটির অর্থ "আদর্শ সংস্কারক" হিসেবে ব্যাখ্যা করে।

মুজাদ্দিদিয়া তরিকা

শায়ক আহম্মদ শিরশিরিয়া মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ এর প্রতিষ্ঠিত তরিকাকে মুজাদ্দিদিয়া তরিকা বলা হয়। এটি মুলত বাহা - উদ-দিন নকশা বন্দী রহ. এর নকশবন্দিয়া তরিকার একটি গুরত্বপূর্ণ সংস্করণ। তাই একে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া তরিকাও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ভারত, পাকিস্তান তুরস্ক ইত্যাদি দেশে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিয়া তরিকার প্রচলন বেশি। তবে সকল মুসলিম দেশেই এই তরিকার অনুসারি দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সকল দরবার ও পীর সাহেব এই তরিকার অনুসারী।

বাংলাদেশে এই তরিকার সফল প্রচারক হযরত খাজা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী।

মুহম্মদিয়া তরিকা

সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলভী রহ এই তরিকার ইমাম। এই তরিকা মুলত নকশিবন্দিয়াব- মিজাদ্দিদিয়া তরিকার একটি শাখা। বাংলাদেশ ও ভারতের ও অনেক দরবার শরীফ এই ছিলছিলার অনুসারি। ফুরফুরা ছুরছিনা , ফুলতলি, রাজারবাগ, দিনাজপুর নূরীয়া, জৈনপুরী, ফরায়েজিকান্দি, সোনাকান্দা ইত্যাদি দরবার শরীফ এই ছিলছিলার অন্তর্ভূক্ত।

উম্মিয়া তরিকা

সমসাময়িক কালে প্রতিষ্ঠিত একটি তরিকা। এই তরিকায়ে উম্মিয়াহ প্রতিষ্ঠা করে *রাজারবাগ বদরবার,* ঢাকা। এটি নকশবন্দিয়া -মুজাদ্দিদিয়া তরিকার একটি সংস্করণ। এই তরিকায় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুন্নত পালনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

বেকতাশিয়া তরিকা

তেরো শতকে ইসলামী সুফি সাধক বেকতাশ ভেলি বেকতাশি তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। পনের শতকে তরিকাটির প্রাথমিক পর্যায়ে হুরুফি আলী আল-আলা কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং ষোল শতকে বালিম সুলতান তরিকাটিকে পুর্নগঠন করেন।

মাদারিয়া তরিকা

মাদারিয়া তরিকা উত্তর ভারত , বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ মেওয়াত অঞ্চল, বিহারব, গুজরাত ও বাংলায় জনপ্রিয় এবং একইসাথে নেপালে ও বাংলাদেশেও জনপ্রিয় সুফি তরিকা। প্রচলিত প্রথাভাঙ্গা, বাহ্যিক ধর্মীয় অনুশীলনের উপর শিথীলতা এবং আত্ম *যিকিরের উপর জোর প্রয়োগের করনে সুপরিচিত,* এটি প্রখ্যাত সুফি সাধক সৈয়দ বদিউদ্দিন জিন্দা শাহ মাদার (মৃত্যু ১৪৩৩খ্রি:) কর্তৃক প্রবর্তিত সূফি তরিকা এবং

উত্তর প্রদেশ কানপুর জেলার মকানপুরে তার দরবার (*দরগাহ*) কেন্দ্রিক তরিকা। তিনি তেরো শতকে আশরাফ জাহাঙ্গীর সেমনাণী সহ ভারতে আগমন করেন।

সুফিবাদের এই শাখা হজরত আলীর নিকট হইতে হজরত হাসান বসরী মারফত তাঁর শিষ্য খওয়াজা হাবিবে আজমী-এর সহিত সংযোগ সূত্র স্থাপন করে। খওয়াজা হাবিবে আজমীর নিকট হইতে তাঁর শিষ্য/মুরিদ বায়েজিদ বোস্তামী মারফত তৈয়ফুরিয়া প্রবর্তন হয়। তৈয়ফুরিয়া তরিকা থেকে শুরু করে, তাঁর পীর বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক বায়াজীদ তায়ফুর আল- বোস্তাকর্তৃক প্রবর্তিত তৈয়ফুরিয়া তরিকা থেকে উৎপত্তি হয়ে মাদারীয়া তরিকা ১৫ থেকে ১৭ শতকের মাঝামাঝি মুগল আমলে বিশেষ গৌরব অর্জন করেছিল এবং শাহ মাদারের শিষ্যদের মাধ্যমে ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা, বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এ নতুন তরিকা ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ সুফি তরিকার মতই এটির প্রতিষ্ঠাতা মাদারের নামে একটি নিস্বাকে যুক্ত করে নির্মিত হয়েছে যা মাদারিয়া তরিকা নামে পরিচিত।

কুবরাইয়া তরিকা

কুবরাইয়া তরিকা তেরো শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান উজবেকিস্তানের বুখারায় তরিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন নাজমুদ্দীন কুবরা নামে একজন ইসলামিক সুফি সাধক। ১২২১ সালে মঙ্গোলরা বুখারাকে দখল করে নিয়েছিল, তারা এলাকাটির প্রায় মানুষকেই গণহত্যার মাধ্যমে হত্যা করেছিল। মঙ্গলদের দ্বারা নিহতদের মধ্যে শেখ নাদজম ইদ-দিন কুবরাও ছিলেন।

মেভলেভি বা মৌলভি তরিকা

মেভলেভি বা মৌলভি তরিকা (তুর্কি:Mevlevilik বা Mevleviyye; ফারসি: طریقت مولویه) কোনিয়ার (বর্তমানে তুরস্কে) একটি সুফি তরিকা। ১৩শ শতাব্দীর কবি, আইনবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক, অতীন্দ্রিবাদী ও সুফি জালালউদ্দিন রুমির অনুসারীরা তার মৃত্যুর পর এই তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমা বিশ্বে এই তরিকার অনুসারীদেরকে ঘূর্ণায়মান দরবেশও বলা হয়।

মুরিদিয়া তরিকা

মুরিদিয়া তরিকা সেনেগাল ও গাম্বিয়ার অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ ইসলামি সুফি তরিকা। এই তরিকার মূল কেন্দ্র সেনেগালের তওবাতে, শহরটি এই তরিকার একটি তীর্থস্থান। আরবি শব্দ মুরীদ যার অর্থ ইচ্ছাপোষণকারী, থেকে এই তরিকার নামকরণ করা

হয়েছে। ১৮৮৩ সালে আমাদু বাম্বা সেনেগালে মুরিদিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সেনেগালের প্রায় ৪০% মানুষ মুরদুয়া তরিকার অনুসারী।

রায্যাক্কীয়্যাহ্ তরিকা

রায্যাকিয়া তরিকা পৃথিবীর প্রাচীনতম সুফি তরিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। রায্যাক্ক আলী গিলানীর (১০৯৩-১২০৮খৃঃ) নাম থেকে এই তরিকার নামকরণ করা হয়েছে। গিলান ইরানের একটি প্রদেশের নাম এবং এর অধিবাসীদের গিলানী বলা হয়ে থাকে। এই তরিকা ইসলামি বিশ্বে সর্বাধিক বিস্তৃততম সুফি তরিকাগুলো একটি এবং এশিয়া, হিন্দুস্তান পাকিস্তান,বাংলাদেশ, নেপাল এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এই তরিকার অনুসারী রয়েছে। অনেকেই এই তরিকাকে "জালালী" তরিকা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, কারণ এই তরিকায় জিকির (স্রষ্ঠাকে স্মরণ করা) জালালতভাবে করা হয়ে থাকে যদিও অন্যান্য তরিকাগুলোতে উচ্চস্বরে বা হালকা উচ্চস্বরে জিকির করা হয়ে থাকে। ইসলামের মূলধারার বাইরে রায্যাক্কীয়্যাহ্ তরিকা কোন বিশেষ মতবাদ বা শিক্ষা গড়ে তোলেনি। এই তরিকার অনুসারীরা ইসলামের মৌলিক নীতিগুলিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই নীতিগুলোকে তারা ব্যাখ্যা করে। এই তরিকার বর্তমান মূল কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী থানার অন্তর্গত দরবারে, শহরটি এই তরিকার একটি তীর্থস্থান।

নি'মাতুল্লাহি তরিকা

নি'মাতুল্লাহি তরিকা পারস্যের সর্বাধিক বিস্তৃত সুফি তরিকার একটি। এটি শাহ নি'মাতুল্লাহ ওয়ালী (মৃত্য ১৩৬৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা মা'রুফিয়াহ ধারার উত্তরাধিকার থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং রূপান্তরিত হয়েছিল। বর্তমানে এই তরিকার অনেকগুলো উপশাখা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত ও প্রভাবশালী *ড. জাবেদ নূরবখশের* বংশধর যিনি ইরানে ১৯৭৯ সালের বিল্পবের পর পশ্চিমা বিশ্বকে এই তরিকার সাথে পরিচয় করান।

সেনুসি তরিকা

সেনুসি একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক সুফি তরিকা যা মুহাম্মদ ইবনে আলী-সেনুসসি কর্তৃক। মিশরীয় উলেমার সমালোচনার কারণে মুহাম্মদ ইবনে আলী-সেনুসি এই তরিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূলত মক্কাতেএই আদর্শের সূচনা হয়, তবে ওহাবীদের অত্যধিক চাপের কারণে আস-সেনুসি মক্কা ছেড়ে চলে যান এবং সাইরেইনিকায় বসতি স্থাপন করেন যেখানে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ইদ্রিস বিন মুহম্মদ আল-মাহদী আস-

সেনুসি সাইরেইনিকার আমির পদে অধিষ্ঠিত হন এবং লিবিয়ার রাজা পর্যন্ত হয়েছিলেন। মুয়াম্বার গাদ্দাফি তার এই রাজতন্ত্র বিলুপ করেন, কিন্তু লিবিয়ার এক তৃতীয়াংশ লোক এখনও নিজেকে সেনুসি বলে দাবি করেন।

শাযিলিয়া তরিকা

শাযিলিয়া তরিকা হল আবুল-হাসান-আশ-শাযিলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুফি তরিকা। এই তরিকার মুরিদরা (অনুসারী) প্রায়শ শাযূলিয়া নামে পরিচিত। ফাসিয়া তরিকা, শাযিলিয়া তরিকার একটি শাখা, মক্কার ইমাম আল ফাসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই তরিকার অসংখ্য অনুসারী সৌদি আরব, মিশর, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে রয়েছে।

সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা

সোহরাওয়ার্দিয়া হল সুফি আবুল নাজিব সোহরাওয়ার্দি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুফি তরিকা। তার ভাতিজা শাহাব আল-দীন আবু হাফস উমর সোহরাওয়ার্দী দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।

তিজানিয়া তরিকা

তিজানিয়া তরিকা শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর গুরুতারোপ করেছে এবং শিষ্যদের মধ্যে একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের উপরের জোর দিয়েছে।

এছাড়া মাদারিয়া, আহমাদীয়া কলন্দরিয়া রাহে ভান্ডার নামে আরও কয়েকটি তরিকার উদ্ভব ঘটে।

ওয়ার্সী (ওয়ারেছী) তরিকা

হযরত হাজী হাফেজ সাইয়্যাদ ওয়ারেছ আলী শাহ্ আল হোসাইনী (রঃ)। তিনি হযরত সাইয়্যাদ ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর ২৬ তম মতান্তরে ২৮ তম বংশধর। তিনি চিশতিয়া ও কাদেরিয়া তরিকার সমন্বয়ে *ওয়ারেছী* তরিকা প্রবর্তন করেন। এই তরিকার মূল বাণী সৃষ্টি কর্তার সঙ্গে "*ইশক*" বা প্রেম। ভারত উপমহাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় ১০ টার মত দেশে তিনি তার তরিকা প্রচার করে গেছেন। ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাবাংকিতে তার মাজার অবস্থিত। তাকে ১৯ শতকের শ্রেষ্ঠ ওলী বলা হয়।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর মতে, “আল্লাহর ব্যাতীত অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে প্রবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ন রূপে আল্লাহুতে নিমগ্ন হওয়ার নামই সূফী বাদ বলে।

সুফীবাদের মূলনীতি ও স্তর সমূহঃ

সুফীবাদ এক প্রকার রহস্যময় হৃদয়ভিত্তিক ও আত্মোপলব্ধিমূলক মতবাদ। একে রুহানী প্রশিক্ষণও বলা হয়। ব্যক্তির আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরম সত্তার সন্ধানই এর লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সুফীগণ কতগুলো মূলনীতি ও স্তর তৈরি করেছেন। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো।

মূলনীতি সমুহঃ-

১. তাওবা : অন্যায় ও পাপের ওপর আন্তরিক অনুশোচনা, অন্যায়ের স্বীকৃতি ও বিষ্যতে এ কাজ না করার দীপ্ত শপথ। তাওবা হচ্ছে সুফী মতবাদের প্রথম মূলনীতি।

২. তাওয়াক্কুল : সর্বাবস্থায় দয়াময় আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই তাওয়াক্কুল।

৩. পরিবর্জন: এ প্রসঙ্গে নিজামুদ্দীন আওলীয়া বলেন : “স্বল্প আহার, স্বল্প কথন, স্বল্প মেলামেশা, স্বল্প নিদ্রার মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের পূর্ণতা।”

৪. সবর : যে কোন অবস্থায় অস্থির না হয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে মেনে নেয়াই সবরের একমাত্র দাবী।

৫. আত্মসমর্পণ : গুরুও কাছে নিজ আত্মাকে সোপর্দ করে দিতে হবে।

৬. ইখলাস : নিছক আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সব কাজ করতে হবে।

৭. আল্লাহর প্রেম : অন্তরে পার্থিব জগতের কোনকিছুর প্রেম ও মোহ থাকতে পারে না। সর্বক্ষণ আল্লাহকে পাওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে।

৮. আল্লাহর যিকর : আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও অন্তরকে পরিশুদ্ধি করার জন্য সর্বদা আল্লাহর যিকর ।

৯: শুকুর : আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান ও আনুগত্যকরণ শুকর বলা হয়।

স্তরসমুহঃ

১. ফানাফিস শায়েখ : এই স্তরে সাধক তার মোরশেদের সাথে বিলীন হয়ে যায় আর সে ওই ভাবেই চলে যেভাবে তার মোরশেদ চালায়। আর এই অবস্থায় স্থায়ী হলে মোরশেদ তাকে রাসুল (দ:) এর কাছে পৌছে দেন।

২. ফানাফির রাসূল : এই স্তরে সাধক গন রাসুল (দ:) এর সাথে বিলীন হয়ে যায় আর সে ওই ভাবেই চলে যেভাবে রাসুল (দ:) চালায়। আর এই অবস্থায় স্থায়ী হলে রাসুল (দ:) তাকে এর মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে পৌছে দেন।

৩. ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ :

ফানা ফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহ হচ্ছে সুফী সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে পৌঁছলে সুফী নিজের ব্যক্তিগত চেতনাকে মুছে দিয়ে ঐশী চেতনায় উন্নীত হন। ব্যক্তিগত চৈতন্য খোদার ধ্যান ও প্রেমে সমাহিত হয়। তাই আত্মচেতনার অবলুপ্তিকেই বলা হয় ফানা।

ফানার শেষ পর্যায়ে শুরু হয় বাকার প্রাথমিক পর্যায়।

সুফিবাদ কি ইসলাম সমর্থন করে?

সুফিবাদ হলো ইসলামের আধ্যাত্মিক বা অভ্যন্তরীণ দিক। আত্মা পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এর মূল লক্ষ্য। ইসলামে সুফিবাদ অনুমোদিত এবং এর মূল ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ। তবে সুফিবাদ চর্চায় ইসলামবিরোধী কোনো অতিরিক্ত বিশ্বাস বা আচার (যেমন: শিরক বা বিদ'আত) যুক্ত হলে তা ইসলাম সমর্থন করে না।

সুফিবাদ ও ইসলামের সম্পর্ক মূলত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়:

- সমর্থনকারী দৃষ্টিভঙ্গি: সুফিবাদকে ইসলামের 'হৃদয়' বা আধ্যাত্মিক চর্চা মনে করা হয়। ২০০৫ সালে জর্ডানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে সুফিবাদকে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় । এর চর্চা যেমন যিকির (আল্লাহর স্মরণ), ইবাদতে একনিষ্ঠতা (ইহসান) এবং আত্মশুদ্ধি সরাসরি কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত।
- সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি: ইসলামি পণ্ডিতদের একটি অংশ মনে করেন, সুফিবাদের নামে প্রচলিত কিছু বাড়াবাড়ি, যেমন- পীর-মুরিদিতে অন্ধভক্তি বা শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন, ইসলাম সমর্থন করে না। তাদের মতে, ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর দেখানো পথ অনুযায়ী হতে হবে।

সুতরাং, শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের সুফিবাদ ইসলাম পূর্ণ সমর্থন
করে।

ইসলামের বাইরে সুফিবাদের উপলব্ধি

সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন। ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক চর্চা হিসেবে এর উৎপত্তি হলেও, বর্তমানে এটি একটি স্বাধীন জীবনবোধ হিসেবে বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের মাঝেও সমাদৃত।

ইসলামের গণ্ডির বাইরে সুফিবাদের উপলব্ধিকে কয়েকটি প্রধান দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়:

- সর্বজনীন প্রেম ও মানবতাবাদ: সুফিবাদ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়। এর মূল বাণী হলো— স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা এবং সকল সৃষ্টির প্রতি অকৃত্রিম মমতা। এই প্রেম ও মানবতার আদর্শকে অন্য ধর্মের মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে।
- দার্শনিক সাহিত্য ও সঙ্গীত: রুমী, হাফিজ, বায়েস্তামী বা লালন সাঁইয়ের মতো সুফি সাধকদের কবিতা ও সঙ্গীত (যেমন- কাওয়ালি) ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে আকর্ষণ করে। অমুসলিমরা সুফি সাহিত্যকে অন্তর্নিহিত সত্য ও পরমাত্মার মিলনের পথ হিসেবে উপলব্ধি করেন।
- ইউনিভার্সাল সুফিজম (সার্বজনীন সুফিবাদ): বিংশ শতাব্দীর শুরুতে হযরত ইনায়েত খানের মতো সাধকরা পাশ্চাত্যে 'ইউনিভার্সাল সুফিজম' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধারায় বিশ্বাস করা হয়, সুফিবাদ হলো সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত নির্যাস বা সার। এখানে সুফি সাধনায় অংশ নিতে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।
- আত্মিক পরিশুদ্ধি ও মেডিটেশন: ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাইরে সুফিবাদকে অনেক অমুসলিম নিছক আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন, মনের শান্তি এবং মেডিটেশন বা ধ্যানের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে দেখেন।

যাইহোক, ঐতিহ্যগত ইসলামিক স্কলারদের মতে, তাসাউফ বা সুফিবাদ কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইসলামের বাইরে সুফিবাদের এই চর্চাকে অনেক সময় মূলধারার ইসলাম 'নতুন যুগের আধ্যাত্মিকতা' বা নিউ-এইজ মুভমেন্ট (New Age movement) হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে। তবে আধ্যাত্মিক ঐক্য ও মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে এর আবেদন আজ বিশ্বজনীন।

সুফিবাদের গুরত্বঃ

সুফিবাদ মূলত ইসলামের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক। এর মূল গুরুত্ব হলো আত্মার পরিশুদ্ধি, ঐশ্বরিক প্রেম ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা। এটি মানুষের অন্তরের অহংকার, হিংসা ও লোভ দূর করে আত্মিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।

সুফিবাদের প্রধান গুরুত্ব ও প্রভাবগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতা: পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে লোভ, হিংসা ও পরনিন্দা বর্জন করে মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধন করা।
- ঐশ্বরিক প্রেম ও ভক্তি: আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে আল্লাহর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।
- মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা: 'সকল মানুষই স্রষ্টার সৃষ্টি' এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও উদারতা প্রদর্শন।
- শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন: সুফি সাধকগণ সবসময় উগ্রবাদ, ঘৃণা ও হানাহানি পরিহার করে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার করেছেন।।

ইসলাম প্রচারে সুফিদের ভূমিকা (বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে)ঃ

সুফিদের উদারতা, মানবিকতা এবং সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব ফেলেছিল এবং এই অঞ্চলে ইসলামের মসৃণ প্রচারে সহায়ক ছিল। এছাড়া, সুফিরা জাকাত, দান এবং সামাজিক সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করেন। ফলে, ইসলামের শিক্ষা দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয় এবং নতুন মুসলিম সমাজ গঠিত হয়। সুফিদের প্রভাব কেবল তাদের সময়কালেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাদের আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিকতাবাদ বাংলার মুসলিম সমাজের ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সুফি সাধকদের দরবার /দরগা কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে বর্তমানেও কতিপয় কামেল আওলিয়াগণের দরবার থেকে হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণে নিয়মিত সদকায়ে জারিয়া হিসেবে আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বোপরি, হজরত শাহজালাল (রহ.) এবং শাহ মকদুম (রহ.)-এর মাজারগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি প্রমাণ করে যে সুফি সাধকদের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত।

সুফিবাদের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এর সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বহুলাংশে টিকে আছে। সুফি সাধকদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বাংলায় একটি উদার এবং সমন্বয়মূলক ইসলামের বিকাশ ঘটেছে, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশে সুফিবাদ আজও সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক চর্চা হিসেবে প্রচলিত থাকলেও এর সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাংলাদেশে সুফিবাদের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো বহুমাত্রিক এবং জটিল। একদিকে, বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির প্রসারের ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সুফি আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কট্টরপন্থার উত্থানও সুফিবাদের জন্য বড় একটি হুমকি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কিছু কিছু ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী সুফিবাদের উদার, মানবিকতাবাদী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শনকে সমালোচনা করে থাকে, বিশেষ

করে মাজারভিত্তিক পীরভক্তি এবং আধ্যাত্মিক সাধনাকে তারা 'শিরক' ও 'বিদাত' হিসেবে চিহ্নিত করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সুফিবাদের ভিত্তি নিয়েও ইদানীং প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। তবে প্রথিতযশা ইসলামি চিন্তাবিদগণের মতে, তাসাউফ সুফিবাদের মূল উৎস এবং এই তাসাউফের শিক্ষা রাসুল (সা.)-এর সময় থেকেই চালু আছে। তাদের মতে, মসজিদে নববীর বারান্দায় একশ্রেণির সাহাবি সবসময় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে সর্বদা মসগুল থাকতেন, যাদের "আসহাবে সুফফা" বলা হয়। মূলত তাদের মাধ্যমেই সুফিবাদের গোড়াপত্তন হয়, যা পরে বিবর্তিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি, কতিপয় সুফি প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সমালোচকগণের মতে, কিছু দরবার/দরগা আধ্যাত্মিকতার চেয়ে আর্থিক প্রাপ্তি এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করায় সুফিবাদকে আরও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে।

অধিকন্তু, কতিপয় পথভ্রষ্ট প্রতিষ্ঠানের আধ্যাত্মিকতার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতির ফলে অনেক সাধারণ মানুষ সুফি দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলামি আলেম এবং চিন্তাবিদদের একটি বড় অংশের মতে, যারা অনৈতিক এবং বেশরিয়াতি কাজে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ এবং অহিংস ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে ইসলামের লেবাসধারী গুটিকয় অনৈতিক মানুষের দায় গোটা সুফি সম্প্রদায়ের ওপর চাপানো অন্যায় এবং ইসলামবহির্ভূত কাজ হবে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুফিবাদের অন্তর্নিহিত উদারতা এবং মানবিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা জরুরি, যাতে এটি আধুনিক সমাজে তার ভূমিকা বজায় রাখতে পারে। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচারে সুফিবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং সুদূরপ্রসারী। সুফি সাধকরা তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের মাধ্যমে ইসলামকে এই অঞ্চলে গভীরভাবে প্রোথিত করেছিলেন। তারা কেবল ধর্মীয় প্রচারক হিসেবেই নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথিকৃৎ হিসেবেও কাজ করেছেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলে বাংলায় ইসলামের এক উদার, সহনশীল এবং মানবিক রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা আজও বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ।
মাতৃভূমি বাংলাদেশেও রয়েছে অসংখ্য

সুফী তরীকা ও মতবাদ।
মুসলমানদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমরা এ আকীদা-বিশ্বাস ও আমল করবো। যাতে একজন মুসলিম এ সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং যারা সুফী দর্শনে বিশ্বাসী তারাও যেন সুফীবাদের সমস্যাগুলো জানতে পারেন এবং প্রচলিত সুফীবাদের বিশ্বাস, কথা ও কাজগুলো কুরআন ও হাদীছের কতটুকু কাছে বা তা থেকে কতটুকু দূরে তাও অনুমান করতে পারেন। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক কথা শুনা ও তা মানার তাওফীক দেন। আমীন।

প্রচলিত সুফীবাদের কতিপয় বিশ্বাস

সুফীবাদের যেহেতু বিভিন্ন তরীকা রয়েছে তাই তরীকা ও মাশায়েখ অনুযায়ী তাদের রয়েছে বিভিন্ন আকীদা ও কার্যক্রম।

ইসলামের দৃষ্টিতে সুফিবাদ

ইলমে তাসাউফ বা সুফিবাদের উদ্ভব যে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা থেকেই– এতে কোনো সন্দেহ নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এমন সব রহস্যপূর্ণ বাণীর অবতারণা করেছেন, যা দিগ্বিজয়ী সৈন্যদেরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্যানমগ্ন ও মরমি ভাবাপন্ন সুফিতে পরিণত করেছিল। তাছাড়া রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী ও কর্মের মধ্যে তাসাউফের বীজ সম্ভাবনাময় মহিরুহরূপে নিহিত ছিল। তাসাউফের পথ-পরিক্রমা ও তরিকতের শাজরানামায় (পীর পরম্পরা তালিকা) প্রথম সুফি ও পীর (মুর্শিদ/শায়খ) হিসেবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই উল্লেখ করা হয়। কাজেই সুফিতত্ত্বের উন্মেষ ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। ইসলামে এটা নতুন কোনো সংযোজন বা সংস্কার

নয়। তাই যুগে যুগে মুসলিম মনীষী, ইমাম ও মুজতাহিদরা এই ইলমে তাসাউফের চর্চা ও অনুশীলন করে যান।

আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও মানবীয় সত্তার পূর্ণ বিকাশে ইলমে তাসাউফ চর্চার আবির্ভাব। এ বিশ্বে সুফি আগমনের ধারাবাহিকতায় ইমাম আহমদ রেজা (রা.) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ সুফি ছিলেন। তাই তিনি যেমন শরিয়তের ইমাম, তেমনি তরিকতেরও ইমাম। সব প্রসিদ্ধ তরিকার খেলাফত ও এজাজত তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজেকে শুধু ইলমে তাসাউফ চর্চায় ব্যাপৃত রাখেননি, বরং তাসাউফ চর্চার নামে কিছু বিভ্রান্ত সুফি কর্তৃক সৃষ্ট যাবতীয় কুপ্রথা ও ভুল ধারণার সংশোধন এবং তরিকতকে সুশৃঙ্খল নিয়মে ফিরিয়ে আনতে নিয়মিত কলমযুদ্ধও চালিয়ে যান।

আজকাল অনেকে এ বলে অনর্থক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন, তরিকত ও শরিয়ত দুটি ভিন্ন জিনিস। ইমাম আহমদ রেজা (রা.) এ মতের ঘোর বিরোধিতা করেন। শরিয়তের বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে যারা নিজেকে সুফি বা তরিকতপন্থি বলে বেড়ান, তিনি তাদের প্রবঞ্চনা থেকে দূরে থাকা উচিত বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, শরিয়ত হলো তাসাউফের পথ-পরিক্রমায় প্রারম্ভিক স্তর। শরিয়তের যথার্থ চর্চা ও অনুশীলন ছাড়া মারিফাত (খোদা পরিচিতি ও প্রাপ্তি, যা সুফিদের পরম লক্ষ্য) অর্জন সম্ভব নয়। শরিয়ত মারিফাতের ভিত্তি।

তিনি লিখেছেন, 'শরিয়ত হলো মূল আর তরিকত হলো শাখা। শরিয়ত হলো ঝরনার উৎসমূল আর তরিকত হলো এ থেকে সৃষ্ট দরিয়া। শরিয়ত থেকে তরিকতকে আলাদা করা অসম্ভব এবং সুকঠিন। শরিয়তের ওপর তরিকত নির্ভরশীল।' ইমাম আহমদ রেজা (রা.) শরিয়তকে তাসাউফের পথে উন্নতি ও সফলতা লাভের একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতেন। এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 'তরিকতের মধ্যে যা কিছু রহস্য লুক্কায়িত আছে, তা শরিয়তের অনুসরণের কারণে। না হয় শরিয়তের অনুসরণ ছাড়া বড় বড় পাদ্রী, যোগী ও সন্ন্যাসীদেরও কাশ্‌ফ অর্জিত হয়। তারপরও তারা জান্নাতি নয়।'

সব মিলিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে তাসাউফ বা সুফিবাদের স্বরূপকে এভাবে তুলে ধরা যায়। সুফিবাদে শরিয়তে নববির কোনো খেলাপ নেই; পীর বা মুর্শিদকে তাজিমি সিজদা করার মতো হারাম কর্মকাণ্ড নেই; অশ্লীল গান-বাজনা, খেল-তামাশা, নেশা জাতীয় দ্রবাদি গ্রহণ-সেবন বা পান সম্পূর্ণরূপে হারাম; তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে

'সামা'-'কাউয়ালি' করা জায়েজ। সুফিবাদে ধার্মিকতা আছে কিন্তু ধর্মান্ধতার কোনো স্থান নেই; সংসারবিমুখতা তথা বৈরাগ্যবাদ চর্চার সুযোগ নেই, কিন্তু নির্জনে মোরাকাবা-মোশাহাদা করার বিধান আছে। সুফিবাদ হচ্ছে ইমান হিফাজত করা, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা, রিপুতাড়িত মূর্খতা, শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুক, কামনা-বাসনা, দুশ্চরিত্রের সঙ্গ পরিহার এবং সর্বসাধারণের সেবা করার নাম।

সুফিবাদে আধুনিক সমস্যাঃ

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ
নিঃশর্তভাবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ
করে চলতেন। তারা নির্দিষ্ট কোন মাজহাব,
তরীকা বা মতবাদের
দিকে নিজেদেরকে নিসবত করতেন না। সকলেই
মুসলিম বা মুমিন হিসেবে পরিচয় দিতেন।
তবে বদরের যুদ্ধ যেহেতু ইসলামের
ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল
এবং তাতে অংশগ্রহণ করা বিশেষ
একটি ফজীলতের কাজ ছিল, তাই যারা বদরের
যুদ্ধে শরীক হয়েছেন
তাদেরকে বদরী সাহাবী,
যারা বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ
করেছিলেন তাদেরকে আসহাবে বাইআত
এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষায় সর্বক্ষণ
আত্মনিয়োগকারী সুফ্ফাবাসী কতিপয় গরীব
সাহাবীকে আসহাবে সুফ্ফা বলা হত। কিন্তু
পরবর্তীর্তে মুসলমানগণ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও
অন্যান্য কারণে বিভিন্ন দলে ও

উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে শিয়া, খারেজী, মুতাজেলা, কদরীয়া, আশায়েরা, জাহমেয়ী এবং আরও অসংখ্য বাতিল ফির্কা ও মতবাদ।

এরই ধারাবাহিকতায় সুফীবাদও একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সুফী মতবাদ কখন থেকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে, তার সঠিক সময় নিধারণ করা কঠিন। তবে এ বিশুদ্ধ মতবাদটি হিজরী তৃতীয় শতকে ইসলামী জগতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন শুধু কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত প্রবণতা, আচরণ ও আগ্রহের মধ্যেই এটি সীমিত ছিল। কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশ পরিহার করে ইবাদতে মশগুল হওয়ার আহবান জানানোর মাধ্যমে এ পথের যাত্রা শুরু হয় ।

পরবর্তীতে ব্যক্তিগতভাবে গড়ে উঠা আচরণগুল করে একটি মতবাদে পরিণত হয় এবং সুফীবাদের নামে বিভন্ন তরীকার আবির্ভাব ঘটে।

এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা, আত্মাকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পরিশুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় দিয়ে অন্তর পরিপূর্ণ রাখা, তাওবা-ইস্তেগফার ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে কলব পরিস্কার রাখার প্রতি সুফীরা আহবান জানায়। নিঃসন্দেহে এই কাজগুলোর প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

করেছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। তবে পার্থক্য হচ্ছে সুফীরা আত্মশুদ্ধি অর্জন ও আত্মার উন্নতির মাধ্যমে আল্লাহর সান্যিধ্যে পৌঁছার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথ বাদ দিয়ে কাশফ এবং মুশাহাদার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কুরআন ও সুন্নাহর পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করার কারণে সুফীবাদের মধ্যে ইউনানী, পারস্য, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য দর্শন প্রবেশ করে। পরিণামে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সুফীবাদের সূচনা হয় কালের পরিক্রমায় তা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি অগ্রহণযোগ্য মতবাদে পরিণত হয়। তাতে প্রবেশ করে ইসলাম ধ্বংসকারী বিভিন্ন শির্ক ও বিদআত। পরিস্থিতি যখন এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করল, তখন উম্মাতের আলেমগণ লেখনী ও ভাষন-বক্তৃতার মাধ্যমে এই মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে সুফী ও তাদের মতবাদ থেকে দূরে থাকার আহবান জানিয়েছেন। আল্লামা ইবনে তাইমীয়ার ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশেও সুফীবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশেও রয়েছে অসংখ্য সুফী তরীকা ও মতবাদ।

মুসলমানদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমরা এ প্রবন্ধে প্রচলিত সুফীবাদের কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও আমল বর্ণনা করবো। যাতে একজন মুসলিম এ সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং যারা সুফী দর্শনে বিশ্বাসী তারাও যেন সুফীবাদের সমস্যাগুলো জানতে পারেন এবং প্রচলিত সুফীবাদের বিশ্বাস, কথা ও কাজগুলো কুরআন ও হাদীছের কতটুকু কাছে বা তা থেকে কতটুকু দূরে তাও অনুমান করতে পারেন। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক কথা শুনা ও তা মানার তাওফীক দেন। আমীন।

প্রচলিত সুফীবাদের কতিপয় বিশ্বাস

সুফীবাদের যেহেতু বিভিন্ন তরীকা রয়েছে তাই তরীকা ও মাশায়েখ অনুযায়ী তাদের রয়েছে বিভিন্ন আকীদা ও কার্যক্রম।

নিম্নে আমরা অতি সংক্ষেপে তাদের কতিপয় আকীদাও বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করবো। এখানে মনে রাখতে হবে যে, সুফীবাদের সকল সমর্থকের ভিতরেই নিম্নের ভুল-ভ্রান্তিগুলো রয়েছে তা বলা হলো.

১) الحلول হুলুলঃ

সুফীদের কতিপয় লোক হুলুল তথা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর অবতরণে বিশ্বাস করে। হুলুল-এর সংজ্ঞায় আলেমগণ বলেনঃ

اماأ لولحلا هانعمف نأ هللا لحي يف ضعب
،هتاقولخم ،اهعم دحتيو داقتعاك
ىراصنلا ةلوله يف ىسيع حيسملا نبا
يف ةلوله سانلا ضعب داقتعاو ،ميرم
،جلاحلا يفو خياشم ضعب ةيفوصلا،

হুলুল এর তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিপয় সৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করেন এবং তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যান। যেমন খৃষ্টানদের ধারণা যে,
ঈসা ইবনে মারইয়ামের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ অবতরণ করেছিলেন।
সুফীদের কতিপয় লোকের বিশ্বাস হচ্ছে প্রখ্যাত সুফী সাধক মানসুর হাল্লাজ এবং অন্যান্য কতিপয় সুফী সাধকের মধ্যে আল্লাহ অবতরণ করেছেন।
নাউযুবিল্লাহ।

২) ةدحو دوجولا ওয়াহদাতুল উজুদঃ
এর তাৎপর্য হচ্ছে, امأو داحتلاا هانعمف
نأ نيع تاقولخملا وه نيع هللا ىلاعت
অর্থাৎ সৃষ্টিজীব এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইবনে আরবী এ মতেরই সমর্থ ছিলেন। তার মতে পৃথিবীতে যা আছে সবই মাবুদ। অর্থাৎ সবই সৃষ্টি এবং সবই মাবুদ। এ অর্থে কুকুর, শুকর এবং অন্যান্য নাপাক সৃষ্টিও মাবুদ হতে কোন বাঁধা নেই।
সুতরাং যারা মূতি পূজা করে তারা আল্লাহরই এবাদত করে। ইবনে আরাবীর মতেঃ

نإ فراعلا لمكملا وه نم ىري ةدابع
ناثولأاو هللا ءيش دحاو

অর্থাৎ পরিপূর্ণ মারেফত হাসিলকারীর

দৃষ্টিতে আল্লাহর এবাদত ও মূর্তিপুজা একই জিনিষ।

ইবনে আরাবী তার কবিতায় বলেনঃ

دبعلا بـر بـرلاو دبع * ايـ تـيلـ يِرعشـ نِم
فـلكملا
نإ تـلق كلذف دبع قحـ * وأ تـلق بـر ىنأف
فـلكيِ

বান্দাই প্রভু আর প্রভুই বান্দা। আফসোস যদি আমি জানতাম, শরীয়তের বিধান কার উপর প্রয়োগ হবে। যদি বলি আমি তাঁর দাস তাহলে তো ঠিকই। আর যদি বলি আমিই রব তাহলে শরীয়ত মানার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

৩) সুফীদের কতিপয় লোক আল্লাহ্ তাআলার সত্বা, নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আশায়েরা ও মাতুরিদীয়া আকীদায় বিশ্বাসী।

৪) অলী-আওলীয়াদের আহবানঃ

তারা নবী ও জিবীত এবং মৃত অলী-আওলীয়াদের কাছে দুআ করে থাকে।

তারা বলে থাকেঃ ইয়া জিলানী,

ইয়া ইয়া রিফাঈ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি।

অথচ আল্লাহ্

তাআলা তাঁকে ছাড়া অন্যেকে আহবান করতে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দুআ করবে, সে মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لاو ُعْدَتْ نِم ِنوُد ِهَّللا لا اَم َكُعَفْنَي لاو َكُّرُضَي
َتْلَعَف ْنِإَف َكَّنِإ اًذِإ َنِم َنيِمِلاَّظلا

“তুমি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন
বস্তুকে ডাকবে না যে তোমার উপকার
কিংবা ক্ষতি কোনটিই করতে পারে না।
যদি তুমি তাই কর তবে তুমি নিশ্চিত ভাবেই
জালেমদের মধ্যে গন্য হবে। (ইউনুসঃ ১০৬)।
আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন:

ْنَمَو ُّلَضَأ وُعْدَيِ نَّمِم ْنِم ِهَّللا ِنوُد ْنَم لا
ُبيِجَتْسَيُ هَل ىَلِإ ِةَماَيِقْلا ِمْوَي ْمُهَو ْنَع
ْمِهِئاَعُد َنوُلِفاَغ

এবং ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশী পথভ্রষ্ট
যে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন ব্যক্তিদেরকে আহবান
করে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার
ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা তাদের ঐ
আহবান থেকে স¤পূর্ন বেখবর রয়েছে?
(আহকাফঃ ৫)

৫. গাউছ, কুতুব, আবদাল ও নুজাবায় বিশ্বাসঃ
সুফীরা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে কতিপয়
আবদাল, কুতুব এবং অওলীয়া আছেন, যাদের
হাতে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবী পরিচালনার
কিছু কিছু দায়িত্ব সোপর্দ করে দিয়েছেন।
সুতরাং তারা তাদের ইচ্ছামত পৃথিবীর
কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। এটি এমন
একটি বিশ্বাস যা মক্কার মুশরিকরাও পোষণ
করত না। আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের
সম্পর্কে কুরআনে বলেনঃ

ْلُق ْنَم ْمُكُقُزْرَي َنِم ِءاَمَّسلا ِضْرَألاَو ْمَأ ْنَم
ُكِلْمَي َراَصْبَألاَو َعْمَّسلا ُجِرْخُي ْنَمَو َّيَحْلا َنِم
ِتِّيَمْلا َتِّيَمْلا ُجِرْخُيَو َنِم ِّيَحْلا ْنَمَو ُرِّبَدُي
َرْمَألا ُهَّللا َنوُلوُقَيَسَف ْلُقَف َالَفَأ َنوُقَّتَت

হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন,

তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন
থেকে কে রুযী দান করেন?
কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক?
তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের
করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য
থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের
ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্!
তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না?
(সূরা ইউনুসঃ ৩১)
তিনি আরও বলেনঃ

ُرِّبَدُيَ رْمَأْلا َنِم ِءاَمَّسلا ىَلِإ ِضْرَأْلا

“তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম
পরিচালনা করেন। (সূরা সাজদাঃ ৫)
এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে,
ث و غ অর্থ হচ্ছে ত্রাণ কর্তা। এটি আল্লাহর
গুণ। কোন মানুষ গাউছ হতে পারে না।
ঢাকা শহরের মহাখালীতে মাসজিদে গাউছুল
আযম নামে বিশাল একটি মসজি রয়েছে।
আমরা সকলেই জানি এখানে গাউছুল আযম
দ্বারা বড় পীর আব্দুল কাদের
জিলানীকে বুঝানো হয়েছে। আল-গাউছুল আল-
আযাম অর্থ হচ্ছে মহান ত্রাণকর্ত।
যারা আব্দুল কাদের
জিলানী (রঃ)কে মহা ত্রাণ
কর্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন, তাদের
কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, তারা কি এ ধরণের কথার মাধ্যমে বড় পীর আব্দুল
কাদের জিলানী (রঃ)কে আল্লাহর সমান করে দেন নি?
৬) সুফী তরীকার মাশায়েখগণ বিপদা-
পদে উদ্ধার করতে পারেনঃ

সুফীরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের মাশায়েখ
ও অলীগণ বিপদাপদ হতে উদ্ধার করতে সক্ষম।
তাই বিপদাপদে তারা তাদের
অলীদেরকে আহবান করে থাকে।
তারা বলে থাকে মদদ ইয়া আব্দুল কাদের
জিলানী, হে উমুক, হে উমক ইত্যাদি।
এভাবে বিপদাপদে আল্লাহ
ছাড়া অন্যকে আহবান করা প্রকাশ্য শির্কের
অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ْنإَو ُهّللا َكْسَسْمَي ٍّرُضِب َفِشاَك َالف ُهَل ّالِإ
َوُه ْنإَو ٍرْيَخِب َكْسَسْمَي َوُهَف ىَلَع ِّلُك ٍءْيَش
ٌريِدَق

"আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট দেন,
তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ
নাই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন,
তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান"।
(সূরা আনআমঃ ১৭)

৭) এবাদতের সময় সুফীরা দ্বীনের সর্বোচ্চ
স্তর তথা ইহসান তাদের নিজ নিজ
মাশায়েখদের দিকে মতাওয়াজ্জেহ
করে থাকে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ناسحلإا هللا دبعت نأ هارت كنأك نإف مل
نكت هنإف هارت كاري

"ইহসান হল, এমন ভাবে তুমি আল্লাহ পাকের
ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ।
যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে (বিশ্বাস
করবে যে,) তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।
(সহীহ মুসলিম)

৮) নবী-রাসূলদের সম্পর্কে সুফীদের ধারণাঃ
নবী-রাসূলদের ব্যাপারে সুফীদের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। তাদের কতিপয়ের কথা হচ্ছে,

انضخ ًارحب ءايبنلأا فـقو هلحاسب অর্থাৎ

আমরা এমন সাগরে সাতার কাটি, নবীগণ যার তীরে দাঁড়িয়ে থাকেন। অর্থাৎ সুফীগণ এমন মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন, যা নবীদের পক্ষেও সম্ভব নয়।

৯) অলী-আওলীয়াদের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসঃ
অলী-আওলীয়াদের ক্ষেত্রে সুফীদের আকীদা হচ্ছে, তাদের কেউ নবীদের চেয়ে অলীগণকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, অলীগণ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর সকল গুণই অলীদের মধ্যে বর্তমান। যেমন সৃষ্টি করা, রিযিক প্রদান করা, কাউকে জীবন দান করা, কাউকে মৃত্যু দান করা ইত্যাদি আরও অনেক।

১০) আমাদের নবী (সাঃ) ক্ষেত্রে সুফীবাদের কতিপয় লোকের বিশ্বাসঃ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সুফীদের বিশ্বাস এই যে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টি জগতের কুব্বা তথা গম্বুজ। তিনি আরশে সমাসীন। সাত আসমান, সাত জমিন, আরশ-কুরসী, লাওহে মাহফুয, কলম এবং সমগ্র সৃষ্টিগত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথার

সত্যতা যাচাই করতে বুসেরীর কাসীদাতুল
বুরদার একটি লাইন দেখুনঃ

َّّنإف نم كدوج ايندلا اهتّرضو + نمو
كمولع حوللا ملعِ ملقلاو

হে নবী! আপনার দয়া থেকেই দুনিয়া ও
আখেরাত সৃষিট হয়েছে। আর আপনার জ্ঞান
থেকেই লাওহে মাহফুয ও কলমের জ্ঞান
উদ্ভাসিত হয়েছে। সুফীদের কতিপয় লোকের
বিশ্বাস যে, তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি।
এটিই প্রখ্যাত সুফী সাধক ইবনে আরাবী ও
তার অনুসারীদের আকীদা। কতিপয় সুফীবাদের
মাশায়েখ এমতকে সমর্থন করেন না।

বরং তারা এ কথাগুলোর প্রতিবাদ করেন
এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ মনে করেন ও
তাঁর রেসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করেন।
তবে তারা রাসূলের কাছে শাফাআত
প্রার্থনা করেন, আল্লাহর কাছে তাঁর
উসীলা দিয়ে দুআ করেন
এবং বিপদাপদে রাসূলের কাছে আশ্রয়
প্রার্থনা করে থাকেন। আসুন
দেখি বুসেরী তার কবিতায় কি বলেছেনঃ

مركأ اي قلخلا ام يل ذولأ نم هب + كاوس
دنع ثداوحلا لولح معلا

“হে সৃষ্টির সেরা সম্মানিত! আমার জন্য
কে আছে আপনি ব্যতীত, যার কাছে আমি কঠিন
বালা মসীবতে আশ্রয়
প্রার্থনা করবো?” (নাউযুবিল্লাহে মিন যা-
লেক)

সুফীবাদের সমর্থক ভাইদের কাছে প্রশ্ন হলো বুসেরীর কবিতার উক্ত লাইন দু'টির মধ্যে যদি শির্ক না থাকে, তাহলে আপনারাই বলুন শির্ক কাকে বলে?

পরিতাপের বিষয় জহচ্ছে আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেসাসে শির্ক মিশ্রিত এ জাতীয় কবিতা পাঠ্য করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এগুলো পাঠ করে ইসলামী শিক্ষার নামে শির্ক ও বিদআতী শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষকগণ যদি শির্ক মিশ্রিত সিলেবাস নির্ধারণ করে তা দিয়ে আমাদের জাতি গঠনের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন, তাহলে আমরা তাওহীদের সঠিক শিক্ষা পাবো কোথায়?

১১) ফিরআউন ও ইবলীসের ক্ষেত্রে সুফীদের একদলের বিশ্বাসঃ ةيفوصلا ةديقع يف

نوعرف سيلبإو

সুফীদের কতিপয় লোক ইবলীস ও ফেরাউনকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা মনে করে। সুফী দর্শনের মতে ইবলীস সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত এবং সে পরিপূর্ণ ঈমানদার। আর মিশরের রিআউন সম্পর্কে সুফীদের কতিপয়ের কথা হচ্ছে, ঈমানের পরিপূর্ণ হাকীকত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই সে একজন সৎ লোক ছিল। ফিরআউনের কথাঃ مكبر انأ ىلعلأا "আমি তোমাদের মহান প্রভু" এর

তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে সুফীদের কতিপয় লোক বলেঃ ফিরআউন নিজের ভিতরে উলুহীয়াতের অস্থিত্ব খুঁজে পেয়েছিল বলেই এ রকম কথা বলেছে। কেননা তাদের মতে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ। সুতরাং প্রতিটি সৃষ্টিই এবাদত পাওয়ার অধিকার রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবলীসের এবাদত করল, সে আল্লাহরই এবাদত করল এবং যে ফিরআউনের এবাদত করল সে আল্লাহরই এবাদত করল। (নাউযুবিল্লাহ)
মানসুর হাল্লাজ
এবং ইবনে আরাবী মনে করেন,
শয়তানকে আল্লাহর রহমত থেকে বিতারিত করা হয় নি এবং সে জাহান্নামীও নয়।
সে তাওবা করে পরিশুদ্ধ
হয়ে জান্নাতী হয়ে গেছে। মানসুর হাল্লাজ সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছে যে, শয়তান ও ফিরআউন হচ্ছে তার আদর্শ ও ইমাম। এই জাতীয় কথা যে, বাতিল ও মিথ্যা তার প্রতিবাদ ছাড়াই ইসলাম সম্পর্কে সামান্য ধরাণার অধিকারী অতি সহজেই বুঝতে পারেন।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ُرانلا َنوُضَرْعُي اًوُدُغ اهْيَلَع اًيشَعَو َمْوَيَو
ُموُقَت ُةَعاّسلا اوُلِخْدَأ َلآ َنْوَعْرِف ّدَشَأ
ِباَذَعْلا

সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। (সূরা মুমিনঃ ৪৬)১২)

১২) কবর ও মাজার সম্পর্কে সুফীদের আকীদাঃ

ةيفوصلا دئاقع يف روبقلا تارازملاو

সুফী ও সুফিবাদের প্রভাবিত ব্যক্তিগণ অলী-আওলীয়া ও তরীকার মাশায়েখদের কবর পাকা করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ, তাতে বাতি জ্বালানো, কবর ও মাযার যিয়ারত করার উপর বিশেষ গুরত্ব প্রদান করে থাকে। অথচ নবী (সাঃ) এ থেকে তাঁর উম্মতকে কবর
নিয়ে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ

ِمُهَّللا يِرْبَق ْلَعْجَت اَل ُدَبْعُي اًنَثَو َّدَتْشا
ِهَّللا ُبَضَغ ىَلَع ٍمْوَق اوُذَخَّتا َروُبُق
ْمِهِئاَيِبْنَأ َدِجاَسَم

হে আল্লাহ্! আমার কবরকে পূজার স্থানে পরিণত করো না, যাতে এর ইবাদত করা হয়। আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন ঐ জাতিকে যারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে কেন্দ্র করে মসজিদ
তৈরী করেছে।” (মুসনাদে আহমাদ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

َنَعَل ُهَّللا ىَراَصَّنلاَو َدوُهَيْلا اوُذَخَّتا
َروُبُق ْمِهِئاَيِبْنَأ َدِجاَسَم

ইহুদী খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহ্র লানত। কারণ তারা তাদের নবীদের
কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।” আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল হায়্যায আল আসাদীকে বলেন,

দুআআমি কি তোমাকে এমন আদেশ দিয়ে প্রেরণ
করব না, যা দিয়ে নবী (সাঃ) আমাকে প্রেরণ
করেছিলেন?

ْنَأ َالَ عَدَت َالَاثمِت ّالِإ ُهَتْسَمَط َالو اَرْبَق
َافِرْشُم ّالِإ ُهَتّيَوَس

কোন মূর্তী পেলেই তা ভেঙ্গে চুরমার
করে ফেলবে। আর কোন কবর উঁচু পেলেই
তা ভেঙ্গে মাটি বরাবর
করে দিবে।” (মুসলিম)
এমনিভাবে নবী (সাঃ) নিষেধ করেছেন, কবর
পাকা করতে, চুনকাম করতে, তার উপর বসতে,
কবরে লিখতে। আর তিনি অভিশাপ করেছেন ঐ
সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা কবরকে মসজিদ
বানায় এবং সেখানে বাতি জালায়। (মুসলিম)
সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন (রাঃ)
এর যুগে ইসলামী শহর সমূহে কোন কবর
পাকা করা বা কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ
করা হয় নি। না নবী (সাঃ) এর
কবরে না অন্য কারও কবরে। এরপরও
কি আমাদের সমাজের বিপথগামী লোকদের হুশ
হবে না?

১৩) মৃত আওলীয়ার নামে মান্নত পেশ করাঃ

ميدقت ءايلولأل رورذنلا تاومألا

সুফীবাদে বিশ্বাসীগণ মৃত অলী-আওলীয়াদের
কবর ও মাজারের জন্য গরু, ছাগল, হাস-মুরগী-
কবুতর, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানত
করাকে ছাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। অথচ
কুরআন ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে জানা যায়
যে মানত হচ্ছে বিরাট একটি এবাদত,
যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও

উদ্দেশ্যে করা সম্পূর্ণ শির্ক।
সুতরাং মান্নত যেহেতু আল্লাহর
একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত, তাই আল্লাহ
ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের
জন্য তা পেশ করা শির্ক। যেমন কেউ
বললঃ উমুক ব্যক্তির জন্য নযর মেনেছি।
অথবা এই কবরের জন্য আমি মান্নত করেছি,
অথবা জিবরীল (আঃ)এর জন্য আমার মানত
রয়েছে। উদ্দেশ্য হল এগুলোর মাধ্যমে তাদের
নৈকট্য অর্জন করা।
নিঃসন্দেহে ইহা শির্কে আকবরের অন্তর্গত।
এ থেকে তওবা করা আবশ্যক। আল্লাহ
তাআলা বলেনঃ “তোমরা যাই খরচ কর বা নযর
মান্নত কর না কেন আল্লাহ্ সে সমপর্কে অবগত
থাকেন। (সূরা বাকারাঃ ২৭০) কোন
বস্তুকে আল্লাহ্র ইলমের সাথে সমপর্কিত
করা হলে সে বিষয় হল ছওয়াব অর্জনের
স্থান। আর যে বিষয়ে ছওয়াব পাওয়া যায়
সেটাই তো ইবাদত। আর যে কোন ইবাদত
গাইরুল্লাহর জন্য সম্পাদন করা অবৈধ।
আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

َنوُفوُي َنوُفاَخَيَو ِرْذَّنلاِب اًمْوَي َناَك ُهُّرَش
اًريِطَتْسُم

তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয়
করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।
(সূরা দাহরঃ ৭) আর এ ধরণের মান্নত
যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তষ্টি ও নৈকট্য
লাভের আশায় করা হয়, যেমন কেউ মান্নত
করল, আমি আজমীর শরীফে কিংবা বড় পীর
আব্দুল কাদের জিলানী অথবা খাজা বাবার

উদ্দেশ্যে একটি ছাগল যবাই করবো,
তাহলে শির্ক হবে এবং তা থেকে বিরত
থাকা ওয়াজিব।

১৪) অলী-আওলীয়ার উসীলাঃ

সকল প্রকার সুফী তরীকার লোকদের আকীদার
একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই যে, তারা মৃত
অলীদের উসীলা দিয়ে দুআ করে থাকেন,
গোনাহ থেকে আল্লাহর
দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উসীলা অর্থ
হচ্ছে, যার মাধ্যমে কারও নৈকট্য অর্জন
করা যায়, তাকে উসীলা বলা হয়। আর কুরআন ও
হাদীছের পরিভাষায় যে সমস্ত বিষয়
দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়,
তাকে উসীলা বলা হয়। কুরআন মাযীদে আল্লাহ
তায়ালা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর
এবং তাঁর নিকট উসীলা প্রার্থনা কর
এবং তাঁর পথে জিহাদ কর,
যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।
(সূরা মায়িদাঃ ৩৫) সাহবা,
তাবেয়ী এবং পূর্ববর্তী সম্মানিত
উলামায়ে কিরাম থেকে উসীলার যে অর্থ
বর্ণিত হয়েছে, তা হল ভাল আমল করার
মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। ইমাম
ইবনে যারীর (রঃ) وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহর সন্তোষ জনক
আমল করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর

নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর। ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন, উসীলা অর্থ নৈকট্য। মুজাহিদ, হাসান, আবদুল্লাহ ইবনে কাছীর, সুদ্দী এবং ইবনে যায়েদ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। কাতাদাহ (রঃ) বলেন, আল্লাহর আনুগত্যমূলক এবং সন্তোষ জনক কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর। উপরোক্ত কথাগুলো বর্ণনা করার পর ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন, উসীলার ব্যাখ্যায় যা বলা হলো, এতে ইমামদের ভিতরে কোন মতবিরোধ নেই। কাজেই আয়াতের মাঝে উসীলার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। (দেখুন তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/১০৩) উপরোক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে যারা আম্বীয়ায়ে কিরাম, আওলীয়াদের ব্যক্তিসত্বা এবং তাদের সম্মানের উসীলা দেয়া বৈধ মনে করে, তাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল এবং কুরআনের আয়াতকে পরিবর্তনের শামিল।

এমনকি কুরআনের আয়াতকে এমন অর্থে ব্যবহার করা, যার কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন মুফাসসিরের উক্তি নেই। আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত আলেম উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে থাকে, আল্লাহ তায়ালা এখানে পীর ধরতে বলেছেন। পীরই হলো উসীলা। পীর না ধরলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এ ধরণের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বানোয়াট। পূর্ব যুগের

গ্রহণযোগ্য কোন আলেম এ ধরণের
ব্যাখ্যা করেন নি।

১৫) ইসলামের রুকনগুলো পালনের
ক্ষেত্রে সুফীদের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

সুফীবাদে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে, তাদের কল্পিত অলীদের উপর নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কোন কিছুই ফরজ নয়। কেননা তারা এমন মর্যাদায় পৌঁছে যান, যেখানে পৌঁছতে পারলে এবাদতের প্রয়োজন হয় না। তাদের কথা হচ্ছেঃ

اذإ تطقس ةفرعملا تلصح ةدابعلا

মারেফত হাসিল হয়ে গেলে এবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের একটি আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

دبعاو كبر كيتأي ىتح نيقيلا

তুমি ইয়াকীন আসা পর্যন্ত তোমার রবের এবাদত কর। (সূরা হিজিরঃ ৯৯)

সুফীরা বলে থাকে এখানে ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে, মারেফত। এই মারেফত হাসিল হওয়ার পূর্ণ পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত করতে হবে। তা হাসিল হয়ে গেলে এবাদতের আর কোন প্রয়োজন নেই। তাদের এই কথাটি সম্পূর্ণ বাতিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ)সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে, মৃত্যু। (দেখুনঃ ইবনে কাছীরঃ (৪/৫৫৩) সুতরাং তাদের কথা হচ্ছে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবাদত সাধারণ লোকেরা পালন করবে।

১৬) সুফীদের যিকির ও অযীফাঃ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
একজন মুসলিম ঘুম থেকে উঠে, ঘুমানোর সময়,
ঘরে প্রবেশ কিংবা ঘর হতে বের হওয়ার সময়
থেকে শুরু করে জীবনের
প্রতিটি ক্ষেত্রে পঠিতব্য অসংখ্য যিকির-
আযকার শিখিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত
সুফী তরীকার লোকেরা এ সমস্ত যিকির বাদ
দিয়ে বিভিন্ন ধরণের বানোয়াট যিকির
তৈরী করে নিয়েছে। নকশবন্দী তরীকার
লোকেরা যিকরে মুফরাদ তথা শুধু الله
(আল্লাহ) الله (আল্লাহ) বলে যিকির করে।
শাযেলী তরীকার لا إله إلا الله
এবং অন্যান্য তরীকার লোকে শুধু هو هو হু হু
বলে যিকির করে থাকে।
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ এভাবে আওয়া
করে বা আওয়াজবিহীন একক শব্দ
দ্বারা যিকির করার কোন দলীল নেই;
বরং এগুলো মানুষকে বিদআত ও গোমরাহীর
দিকে নিয়ে যায়।
(মাজমুআয়ে ফতোয়াঃ পৃষ্ঠা নং- ২২৯) আমাদের
দেশেরে বিভিন্ন পীরদের
মুরীদদেরকে যিকরে জলী ও
যিকিরী খফী নামে বিভিন্ন ধরণের
বিদআতী যিকির করতে দেখা যায়, যেগুলোর
কোন শরই ভিত্তি নেই।
১৭) চুলে ও দাড়িতে ঝট বাঁধাঃ
সুফীবাদের কতিপয় লোকের মাথায় ও

দাড়িতে ঝট বাঁধতে দেখা যায়, কারও
শরীরে লোহার
শিকল, কাউকে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায়
দেখা যায়। এটি সাহাবী,
তাবেয়ী বা তাদের পরবর্তী যুগের কোন আলেম
বা সাধারণ সৎ লোকের নিদর্শন ছিল না।
এমন কি আব্দুল কাদের জিলানী, শাইখ আহমাদ
রেফায়ী এবং সুফীরা যাদেরকে সুফীবাদের
প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন তাদের কেউ এ
ধরণের রেবাস গ্রহণ করেন নি।

১৮) অলী-আওলীদের নামে শপথঃ

অলীও আওলীদের নামে শপথ করা সুফী তরীকার
লোকদের একটি সাধারণ ব্যাপার। অথচ রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেনঃ

ْنَم ِرْيَغِب َفَلَح ِهَّللا ْدَقَف َكَرْشَأ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ
করল সে শির্ক করল। (আবু দাউদ)

১৯) হালাল-হারামঃ

যে সমস্ত সুফী ওয়াদাতুল
উজুদে বিশ্বাসী তারা কোন কিছুকেই হারাম
মনে করে না। মদ, জিনা-ব্যভিচারসহ সকল
প্রকার কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়াই তাদের
জন্য বৈধ।

উপসংহারঃ

সুফিবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পার্থিব লোভ -লালসা ও রিপু দমনের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা।

নিখাদ প্রেম ও ভক্তিম মাধ্যামে আল্লাহর নৈকট্য সন্তুষ্টি লাভ করা। শিরকমুক্ত চিন্তা ও কর্ম বাদ দিয়ে স্রষ্ঠার সাথে গভীর সম্পর্কই সুফিবাদের মূল লক্ষ হোক।

তথ্যসূত্রঃ

ক) আল-কুরআনুল কারীম

খ) সহীহ মুসলিম

গ) ফুসুসুল হিকাম লেখক ইবনে আরাবী

ঘ)তাবলীগি নিসাব ফাজায়েলে আমাল

ঙ) তালীমে মারেফত

চ) সুফীবাদের সমর্থক ও সুফীবাদ দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন বক্তার ক্যাসেট ও সিডি

ছ) সুফীবাদ দ্বারা প্রভাবিত বক্তাদের থেকে শুনা ওয়াজ-নসীহত

জ) ইন্টার নেটের বিভিন্ন ওয়াবে সাইট

ঞ) বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা থেকে